বঙ্গবন্ধুর অর্থনীতি এখন আমরা কোন পথে

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

শোকের মাস এটা। ৪০ বছর আগে ১৫ আগস্ট ভোরের আলো দিগন্তকে

উদ্ভাসিত করার আগেই ইতিহাসের এক বর্বরতম হত্যাকাণ্ডে সপরিবারে হত্যা করা হল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। দৈব সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বেঁচে রইলেন।

বাংলাদেশের কৃষ্ণরজনীর দুই সপ্তাহ আগে ৩০ জুলাই ১৯৭৫ তারিখে স্বামী পরমাণু বিজ্ঞানী এমএ ওয়াজেদ মিয়ার গবেষণাস্থল পশ্চিম জার্মানির বনে চলে যান শেখ হাসিনা— সঙ্গে পুত্র, কন্যা ও ছোট বোন রেহানা। সেদিন তারা দেশে থাকলে আজকের দিনে বিশ্বের

অর্থনীতি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

অর্থনীতি : বঙ্গবন্ধুর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শোক পালন করি। শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে সোনার বাংলা গড়ার শপথ নিই। কেন আমরা বাঙালিরা বছরের প্রতিটি দিন 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা' গড়ে তোলার যে মহামন্ত্রে বঙ্গবন্ধু আমাদের উজ্জীবিত করেছিলেন সে কথাটি স্মরণ করি না? শপথ নিই না বিশেষ করে কম ভাগ্যবান মানুষদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে 'যার যা আছে' তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনীতি কীভাবে, কেমন করে এবং কোন অগ্রাধিকারে গ্রথিত হয়েছিল তা স্মরণ করা যেতে পারে। রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতেখড়ি তার শৈশবে মধুমতী বিধৌত টুঙ্গীপাড়া গিমাডাঙ্গা নদী কিনারে, গ্রামবাংলার মাঠে-ময়দানে। দুটো জিনিস তার মানসিকতায় অর্থনীতি সম্পর্কে রেখাপাত করে। প্রথমত, তিনি দেখেছিলেন দারিদ্র্যের কদর্য কশাঘাতে মানুষ কীভাবে দুর্দশার চরম শিখরে পৌঁছে সর্বস্বান্ত হয়। দ্বিতীয়ত, তিনি উপলব্ধি করেন যে, পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়েরা বেগম পরম মমতায় গরিব-দুঃখীর পাশে দাঁড়াতেন, অন্ন-বস্ত্রের সাহায্যের হাত প্রসারিত করতেন। তাই তো বস্ত্রহীন পথচারীকে গায়ের জামা খুলে দিয়ে এলেও এবং পিতার অনুপস্থিতিতে পারিবারিক গোলা থেকে ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত গরিব-দুঃখীকে ধান বিতরণ করে শেখ মুজিবকে পিতার সস্নেহ অনুমোদন পেতে কষ্ট হয়নি। এরপর ঘটনাবহুল দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি পদে বাধা-বিপত্তি, প্রতিক্রিয়ার জাল ছিন্ন করে ১৯৬২ সাল থেকে একটি স্বাধীন বাংলাদেশের চিন্তা। তবে তাকে এগোতে হয় অতি সতর্কতার সঙ্গে, যাতে কেউ বিচ্ছিন্নতাবাদী অপবাদ দিতে না পারে। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন উচ্চারণ করলেন বাঙালির স্বায়ত্তশাসন তথা ছয় দফা দাবি যা কিন্তু আসলেই স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বাভাস বৈ আর কিছু নয়। খুব ভালো করে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, ওই দাবিগুলো বিশেষ করে দুই মুদ্রা আর স্বাধীন বাণিজ্য অধিকারের প্রস্তাব পাকিস্তান সরকার কখনও মেনে নেবে না, প্রস্তুত হবে স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার পটভূমি। তাই ৭ মার্চের ভাষণে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম' সংবলিত স্বাধীনতার সতর্ক অথচ প্রত্যক্ষ ঘোষণা না হলেও দুঃখী বাঙালির অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের কৃত সংকল্পতাই দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন শেখ মুজিব। শহর, বন্দর, নগর ছাপিয়ে গ্রামবাংলার কোটি মানুষ বাঁশের লাঠিসজ্জিত হয়ে খান সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশ স্বাধীন করতে রাস্তায় নেমে পড়েন, কারণ নেতা তাদের শেখ মুজিব ডাক দিয়েছেন স্বাধীনতার। শহীদানের রক্তগঙ্গায় বহু সাগর পেরিয়ে বহু মূল্যে এলো স্বাধীনতা। সারা বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ ও সরকারের ন্যায়ের পক্ষের প্রচণ্ড চাপে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল। বীরের বেশে ফিরলেন বঙ্গবন্ধু, পরম স্নেহে বরণ করা হল তাকে জাতির জনক হিসেবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম পথপরিক্রমায় যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বঙ্গবন্ধুর সরকার, তার প্রতিটিই চূড়ান্ত বিচারে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ হিসেবে দেখা যেতে পারে। স্বাধীনতার দশ মাসের মাথায় একটি চমৎকার, আধুনিক ও কার্যকর সংবিধান রচিত হল জাতির জনকের প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায়। সংবিধানকে বলা যেতে পারে মাতৃ অবকাঠামো, যার আলোকে সব আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। দেশের গৌরব শীর্ষবিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে রচিত হয়ে অনুমোদিত হল একটি বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক, দেশ ও যুগোপযোগী একীভূত ধারার এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষার বিধানসংবলিত শিক্ষানীতি— সূচিত হল মানবসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি, যার মাধ্যমে দক্ষভাবে বাস্তবায়িত হবে অর্থনীতি বিকাশের পরিকল্পনা। এভাবে রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনের সবক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনায় তৈরি হল নীতিমালা ও কৌশলপত্র, যাতে জনসাধারণের অর্থনৈতিক সচ্ছলতায় গড়ে ওঠে কল্যাণ রাষ্ট্র বাংলাদেশ— গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা ও সমাজতন্ত্রের চারটি স্তম্ভমূলে। তবে বাংলাদেশের সংবিধানে যে সমাজতন্ত্র নক্ষত্রের মতো আলো বিকিরণ করছে, তা কিন্তু কেন্দ্রীভূত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চেয়ে ভিন্ন ধাঁচের। কেন্দ্রীভূত সমাজতান্ত্রিক দেশে সব সম্পদ তথা উৎপাদন উপাদানের পুরোটাই থাকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আর গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর সুস্পষ্ট ইচ্ছার প্রতিফলনে সম্পদের তিন ধরনের মালিকানা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে— ব্যক্তিমালিকানা, সমবায়ী ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন।

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭২-১৯৭৬) প্রণয়ন করেন দেশের চারজন শীর্ষ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক। এ দলিলে সুস্পষ্ট মুন্সিয়ানা ও আবেগে জ্বলজ্বল করছে কল্যাণ রাষ্ট্রে জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক মুক্তির সনদ যা অবশ্যই ছয় দফা ও ৭ মার্চের ঘোষণার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার বিষয়গুলো হল অবকাঠামো পুনর্বাসন ও নির্মাণ (বন্দর, রাস্তাঘাট, কলকারখানা, সেতু, কালভার্ট, স্কুল-কলেজ ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ), শিক্ষা, পরিকল্পিত পরিবার সংবলিত জনসংখ্যানীতি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং আয় ও সুযোগ বৈষম্য হ্রাসকরণ। এখানে উল্লেখ রয়েছে, দেশটির মালিক জনগণ যাদের অনেকেই বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত; তাদের আয় রোজগার সামষ্টিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হতে হবে। প্রয়োজনবোধে বিত্তবানদের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে অধিকতর জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড চালাতে হবে রাষ্ট্রীয় খাতে। তবে দেশীয় উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা দিয়ে শিল্প প্রসারে পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের অন্য একটি ক্ষেত্র কৃষিকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে কিষাণ-কিষাণীর লঘু দোষে রুজু করা লক্ষাধিক সার্টিফিকেট মামলা তুলে নেয়া হয়। কৃষি উপকরণ তথা বীজ, সার ও কীটনাশক উচ্চমূল্যে আমদানি করে নামমাত্র মূল্যে গরিব চাষী ভাইদের মধ্যে বিতরণ করা হয় প্রায় বিনামূল্যে। সাশ্রয়ী সুদে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেয়া হয়। কৃষি উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে এটি করতে হবে বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলেও সেটাই যে প্রকৃষ্ট উপায় হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অর্থনীতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় সর্বশেষ ঘোষণাটি আসে ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালের বক্তৃতায়। তিনি ব্যাপকভিত্তিক কৃষি সমবায়ের ঘোষণা দেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমি খণ্ডের মালিকানা দলিলে অক্ষুণ্ন রেখেই সব কৃষিভূমিকে সমবায়ের অধীনে একীভূত করে আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত চাষবাসের মাধ্যমে পাঁচগুণ ফসল ফলানো সম্ভব হবে। জমিতে যারা শ্রম দেবেন, সে কৃষকরা উৎপাদনের একটি বড় অংশ পাবেন। রাষ্ট্রের কাছেও যাবে একটি অংশ। এভাবে খেটে খাওয়া মানুষের ভাগ্য বিনির্মাণ করা হবে এ প্রক্রিয়ায়। একই সঙ্গে জাতির জনক প্রশাসনে আমূল সংস্কার এনে জেলা গভর্নর পদ্ধতিতে সব প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বিকেন্দ্রীকরণ করার বিরাট পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয় ১ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে জেলা গভর্নর প্রশিক্ষণ মাসব্যাপী উদ্বোধনে। সব মতামতের সমাহারে সরকার গঠন করার অভিপ্রায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে বাকশাল গঠন করেন। এটা যে একদলীয় শাসন তিনি তা মনে করতেন না; তার ধারণা ছিল যে, সব মত ও পথের মানুষকে এক ছায়াতলে আনা হল।

১৫ আগস্টের বিয়োগান্তক ঘটনাবলী সংঘটিত করে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মহান স্বাধীনতার চেতনাকে হত্যা করা হবে বলে যারা মনে করেছিল, সেই কুচক্রীদের উদ্দেশ্য মোটেও সফল হয়নি। আজ বাংলাদেশের বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বিপুল সামাজিক অগ্রগতি সারা বিশ্বে নন্দিত, প্রশংসিত। ১৯৭২ সালে দেশে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল এক কোটি টন, আজ তা প্রায় পৌনে চার কোটি টন। গড় আয়ু ৪৩ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭১ বছরে। শিশুমৃত্যুর হার এখন হাজারে ৩২ এবং ক্রমেই তা আরও কমছে। ১৯৭২ সালে সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করতেন সোয়া পাঁচ কোটি মানুষ; এখন ষোল কোটির মধ্যে চার কোটি। বছরের প্রথম দিনে ৩৬ কোটি নতুন বই বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীরা হাতে পায় উৎসবের আমেজে। শিক্ষার হার এখন শতকরা ষাট ভাগ ছাড়িয়ে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা জনসংখ্যার প্রায় দুই শতাংশ। প্রাথমিকে এখন ভর্তির হার শতভাগের প্রায় কাছাকাছি এবং ঝরে পড়ার হার ত্রিশের কোটায়। বিদ্যুৎ সমস্যার এখন অনেকটাই সমাধান হয়ে গেছে। বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিকরা এখন এমআরপি নিয়ে ভ্রমণ করেন। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ এখন শতকরা ৪০ ভাগ এবং এর গতি ঊর্ধ্বমুখী। ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, সমুদ্রসীমা বিজয় আর গতিময় পররাষ্ট্রনীতির সুফলে বাংলাদেশ আজ অর্থনীতির পরাশক্তিগুলোর বিশেষ দৃষ্টি পাচ্ছে। বলতে দ্বিধা নেই, জাতির জনকের সম্মোহনী ক্ষমতার সমকক্ষ না হলেও নিজ সাহস, দক্ষতা ও অধিকারে রাজনৈতিক নেতৃত্বে আসীন (১৯৬৬ সালে আইয়ুব-মোনায়েমের প্রত্যক্ষ মদদপুষ্টদের হারিয়ে তখনকার ইডেন কলেজ তথা এখনকার বদরুন্নেসা কলেজের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন বেশ দাপটের সঙ্গেই) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির জনকের অর্থনীতির রূপরেখা ধরেই সফলতার পথে অগ্রসর হচ্ছেন। তবে বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত এবং অনেক দেশে সফল সমবায়ের শক্তিশালী মাধ্যমকে অর্থনীতিতে ধারণ, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সমীচীন হবে বলে মনে করি। বলতে দ্বিধা নেই আজকের জটিল বিশ্বে যুগের উপযোগী অর্থনীতি ও রীতিনীতি, কৌশল গ্রহণ করেছেন শেখ হাসিনা— নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বিশ্বব্যাংকের স্বীকৃতি অনুসারে বাংলাদেশ আজ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ। বর্তমান প্রেক্ষিতে প্রযুক্তি নির্ভরতায় উৎপাদনসহ সব কর্মকাণ্ডে দক্ষতা ও উৎকর্ষ আনয়নের অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আমরা অনেকেই পথ চেয়ে আছি— কত শিগগির মধ্যম মানবসম্পদ সূচকে পদার্পণ করবে কল্যাণ রাষ্ট্র বাংলাদেশ— ঘুচে যাবে দুঃখী মানুষের সব অভাব, আপন মহিমায় প্রোজ্জ্বলিত হবে সোনার বাংলার সোনার মানুষ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর